গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ জুন ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

মনোনয়ন পর্বেই ৬ জনের মৃত্যু!

চালু প্রবচন বলে— সকালটা কেমন, তা দেখেই বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। বিগত কয়েক দশকের ট্র্যাডিশন মেনে এ বছরেও পঞ্চায়েত ভোটের কাজ শুরু হতে না হতেই শুধু মনোনয়ন পর্বের মধ্যেই তিন জেলায় বোমা-গুলির আঘাতে ছয়জন নিহত। আহতের সংখ্যা বহু। এ যদি সকালের লক্ষণ হয় তা হলে বাকি সময়টাতে কী হতে চলেছে ভেবেও আতঙ্কে শিউরে উঠছে মানুষ।

আরও চিন্তার বিষয় বোমা-গুলি-আগুনের ঝড়ের মধ্যে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চিন্ত ভাব। তিনি বলে দিয়েছেন, এত শান্তিপূর্ণ মনোনয়ন কোনও দিন হয়নি। শুধু তাই নয়, ভাঙড়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র নিয়ে আইএসএফ এবং তৃণমূলের মারামারির প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বসূরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কায়দাতে 'আমরা ওরা' ভাগ করে নিজের দলের অস্ত্রধারীদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। আজকের দিনের তথাকথিত গণতন্ত্রে দলের সুপ্রিমোর চেয়ারটা যে নির্বাচিত প্রশাসনিক প্রধানের চেয়ারকে সব সময় ছাপিয়ে যায়, নিজের

পাঁচের পাতায় দেখুন

মহান নেতার শিক্ষা থেকে চারের পাতায়

পঞ্চায়েত নির্বাচনে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

১৪০৪টি গ্রামসভা, ৪৬৫টি সমিতি এবং ৩৩২টি জেলা পরিষদে মোট ২২০১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

পূর্ব মেদিনীপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়ন দিয়ে বেরিয়ে আসছেন দলের প্রার্থীরা

কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তানের দশম কংগ্রেসে

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের শুভেচ্ছা বার্তা

প্রিয় কমরেড ইমদাদ কাজি
সাধারণ সম্পাদক
সিপিপি ১৩ জুন, ২০২৩

ইসলামাবাদে আপনাদের পার্টির দশম কংগ্রেসে (১৬-১৮ জুন) আমাদের দলের দু'জন প্রতিনিধির উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও ভিসা না পাওয়ায় আমরা যেতে পারলাম না। দুঃখজনক হলেও এ ঘটনা আমাদের মেনে নিতেই হল।।

পাকিস্তানে চূড়ান্ত নিপীড়নমূলক শাসন বহাল থাকার ফলে যেখানে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ চালানোই প্রায় অসম্ভব, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান সাহসের সঙ্গে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পতাকা উর্ধ্বে তুলে রেখেছে। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

প্রিয় কমরেড, এমন একটা সময়ে আপনারা আপনাদের পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করছেন যখন ভারত ও পাকিস্তান সহ সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গভীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটে নিমজ্জিত। অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকট মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে। উন্নত ও অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশ নির্বিশেষে সর্বত্র জনগণ সমস্যা সংকটে জেরবার হয়ে রাস্তায় শাসকের লাঠি-গুলির মুখেও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

নানা অংশের মেহনতি জনগণের বিক্ষোভের ঢেউ একের পর এক প্রায় রোজই কোথাও না কোথাও আছড়ে পড়ছে। বিক্ষুব্ধ জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বত্রই শাসক শ্রেণিগুলি জনগণকে উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতিবাদ, ধর্মীয় ও ভাষাগত বিভাজন ইত্যাদির ফাঁদে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চাইছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ উত্তেজনা ও আঞ্চলিক যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু শাসক শ্রেণিগুলির এই চক্রান্ত সত্ত্বেও এমনকি আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও প্রায় প্রতিদিন

পাঁচের পাতায় দেখুন

দাঙ্গা বিধ্বস্ত মণিপুরে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ক্যাম্প

৩ মে থেকেই একটানা চলছে মণিপুরের মানুষের রক্তপাত, হাঙ্গামা, ঘরবাড়ি ধ্বংস। হাজার হাজার মানুষ নানা রিলিফ ক্যাম্পে এক মাসের বেশি সময় কাটাচ্ছেন। প্রয়োজনীয় খাবার, পোশাক, ওষুধ, পানীয় জল, শৌচাগারের ব্যবস্থা সরকারি তরফে প্রায় নেই বললেই চলে। স্থানীয় কিছু ক্লাব এবং এনজিও যতটুকু ব্যবস্থা করতে পারছে তার ভরসাতেই মানুষের দিন কাটছে। এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি) আসাম রাজ্য কমিটি প্রতিবেশী রাজ্যের দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পাঠানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। সংগৃহীত অর্থ তুলে দেওয়া হয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের (এমএসসি) হাতে।

এমএসসি-র আসাম রাজ্য ইনচার্জ ডাঃ চিত্রলেখা দাশের নেতৃত্বে চিকিৎসক এবং স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল সড়ক পথ অবরুদ্ধ থাকায় ২৩ মে বিমানে ইম্ফল বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখানে চিকিৎসক দলকে স্বাগত জানান ১২৫তম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মজয়ন্তী কমিটির মণিপুর শাখার সদস্য প্রেমচাঁদ সিং ও তরুণ কুমার সিং। এমএসসি-র সদস্যরা ২৮ মে পর্যন্ত নানা জায়গায় রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া মানুষের চিকিৎসা করেন।

ইম্ফলের খুন্দ্রাকপাম এলাকায় নাওরেম বীরহরি কলেজ, প্রত্যন্ত এলাকার নাংখালওয়াই রিলিফ ক্যাম্প, বিষ্ণুপুর জেলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত মইরাংয়ের কাছে নোংসাম ও পরে ইথিং এলাকায় রিলিফ ক্যাম্প, থোউবলের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সরকারি রিলিফ ক্যাম্পেও তাঁরা যান। ইম্ফল থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে ইংগৌরকে তাঁরা দেখা পান পাহাড় পেরিয়ে আসা দুর্গত মানুষদের। এই ক্যাম্পে বহু মানুষ প্রায় একমাস আশ্রয় নিয়েছেন। ইম্ফলের গৌরগোবিন্দ গার্লস কলেজেও তাঁরা চিকিৎসা করেন।

মেডিকেল টিমের অভিজ্ঞতা, রিলিফ ক্যাম্পগুলিতে পরিষ্কার জামাকাপড় এবং জলের অভাবে ছড়িয়ে পড়ছে চর্মরোগ। অথচ কোনও চিকিৎসার বন্দোবস্ত সরকার করেনি। বহু ক্যাম্পে সরকার সুরক্ষার ব্যবস্থা না করায় হাতে তৈরি বন্দুক আর লাঠি নিয়েই মানুষকে আধুনিক অস্ত্রধারী জঙ্গিদের মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকতে হচ্ছে। এমএসসি-র স্বেচ্ছাসেবকরা স্থানীয় ভাষা না জানায় কয়েকজন যুবককে তাঁরা দোভাষীর কাজ করার অনুরোধ জানান। ওই যুবকরা সানন্দে সাহায্য করেন।

দুয়ের পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্কের লক্ষ কোটি টাকা ইচ্ছামতো লুঠ করতে পারো, রক্ষা করবে সরকার

ঋণের নামে ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দেওয়া কর্পোরেট লুঠেরাদের বাঁচানোর জন্য এবার নতুন পথ বার করছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। ৮ জুন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দিয়েছে, তারা যেন ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের সাথে আপসের মাধ্যমে বিষয়টির ফয়সলা করে নেয়। এ জন্য এমনকি এই ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপ বা ব্যাঙ্ককে ঠকানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনও ক্রিমিনাল কেস দায়ের হয়ে থাকলেও এই আপস করার পরামর্শ দিয়েছে দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। শুধু তাই নয় ১২ মাস 'কুলিং পিরিয়ডে'র পর আবারও এই গ্রাহকদের ঋণ দিতে পারবে ব্যাঙ্কগুলি।

এই পরামর্শটি যে আসলে নির্দেশিকা এবং তা যে সরকারের ইচ্ছানুসারেই জারি করা হয়েছে, তা দেশবাসীর না বোঝার কোনও কারণ নেই। বিশেষত নরেন্দ্র মোদি জমানায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর পদে জো-হুজুর আমলাদের নিয়োগের যে কার্যক্রম চালু হয়েছে, তাতে এমন একটি নির্দেশ সরকারের ইচ্ছা ছাড়া জারি করার কথা শীর্ষব্যাঙ্ক কর্তাদের ভাবাই অসম্ভব। এর মানে দাঁড়াল প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় 'মেহুল ভাই', নীরব মোদি, বিজয় মালিয়া সহ যে সমস্ত পুঁজি মালিকরা ভারতের ব্যাঙ্কের টাকা গায়েব করে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের সাথেও আপস-মীমাংসা করে আবার এদের ঋণ দিতে শুরু করতে পারে ব্যাঙ্কগুলি।

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকাগুলি কাদের? কোন সম্পদ থেকে ব্যাঙ্ক পুঁজিপতিদের ঋণ দেয়? যে কোনও মানুষই জানেন, এর প্রতিটি পয়সা আসে দেশের কোটি কোটি মানুষের ঘাম ঝরানো রোজগার থেকে তিল তিল করে বাঁচানো আমানত থেকে। পুঁজিপতিরা তাদের পিতৃ-মাতৃ উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত কোনও সম্পদ থেকে এই ঋণ নেয় না। এখন থেকে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্কলুঠ আইনসঙ্গত হয়ে গেল। এর জন্য ব্যাঙ্কের ক্ষতির বোঝা বইবে গরিব, মধ্যবিত্ত, সাধারণ করদাতা জনগণ। অথচ মাত্র দু'বছর আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছিল ঋণখেলাপিরা মূলধনী বাজারে ঢুকতে পারবে না। নতুন করে তারা ব্যাঙ্কঋণও পাবে না।

তা হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হঠাৎ উল্টো রাস্তায় হাঁটল কেন? এ কি মোদি সরকারের চাপ ছাড়া হতে পারে? এই নরেন্দ্র মোদির ভারতে ব্যাঙ্কের দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী থাকা ঋণ অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। ব্যাঙ্কিং পরিভাষায় একে বলা হয় অনুৎপাদক সম্পদ বা 'নন পারফরমিং অ্যাসেট' (এনপিএ)। ২০১৪-তে মোদি সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকে ২০২২-এর মার্চ পর্যন্ত এনপিএ-র পরিমাণ ৬৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে সাধারণ মানুষ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নেওয়া ঋণ খুব বেশি নয়। এর অধিকাংশটাই নিয়েছে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একটি সংগঠন দেখিয়েছে কীভাবে সরকার দেউলিয়া আইনে ১৩টি কোম্পানির এনপিএ উদ্ধারের নামে তার ৬৪ শতাংশ মকুব করে দিয়ে সেগুলি আম্বানি, টাটা, মিত্তাল, এসারের মতো বৃহৎ মালিকদের উপহার দিয়েছে। অনিল আম্বানি গোষ্ঠীর ১ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের আবার ঋণ দিতে বাধ্য করছে। আদানি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা একই রকম। কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী রাজ্যসভায় জানিয়েছিলেন, এনপিএ-র ১৩ শতাংশ মাত্র আদায় করা গেছে। ২০২২-এর ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, ২০১৭ থেকে পাঁচ বছরে ব্যাঙ্কগুলি ১০.৯ লক্ষ কোটি টাকা 'রাইট অফ' বা খাতা থেকে মুছে দিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও সরকারেরই নানা হিসাব থেকে বোঝা যায় এই পাঁচ বছরে মুছে দেওয়া ঋণের আসল পরিমাণ হল এনপিএ-র ২২.৩৪ শতাংশ অর্থাৎ সাড়ে ১৪ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী জোরগলায় দাবি করে থাকেন রাইট অফ করা মানেই ঋণ মকুব করা নয়, এই টাকা আদায় করা হবে। বাস্তবে এনপিএর ১ টাকা আদায় হলে ৮ টাকা রাইট অফ করতে বা চিরতরে খাতা থেকে মুছে দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বাধ্য হচ্ছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাঙ্কের সাথে পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধমান প্রতারণা। মোদি সরকারের আমলে এই প্রতারণার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে আগের তুলনায় ১৭ গুণেরও বেশি। ২০০৫ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ঋণ নিয়ে ব্যাঙ্ককে ঠকানো বা প্রতারণার জন্য ক্ষতি হয়েছিল ৩৪ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা। আর ২০১৫ থেকে ২০২৩-এ এই ক্ষতি দাঁড়িয়েছে ৫.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা। একা মেহুল চোক্সিই গায়েব করেছেন, ব্যাঙ্কের ৯২ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। গুজরাটের এবিজি শিপইয়ার্ড কোম্পানি ২৮টি ব্যাঙ্কের কনসর্টিয়ামের থেকে নেওয়া ২২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা গায়েব করে দিয়েছে। মোদি সরকারের প্রথম পাঁচ বছরেই মেহুল চোক্সি, নীরব মোদি, বিজয় মালিয়ার মতো অন্তত ৭২জন পুঁজিমালিক ব্যাঙ্কের টাকা গায়েব করে নিশ্চিন্তে বিদেশে পালিয়েছে। সরকার আটকানোর কোনও চেষ্টাই করেনি। কিন্তু কোনও ছোট ব্যবসায়ী, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কিছু রোজগারের আশায় কোনও বেকার যুব, বেতনভোগী ছা-পোষা মানুষ, ছাত্ররা ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে সামান্য দেরি করলেই পুলিশ থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের আদায়কারী গুন্ডাবাহিনী তাদের পিছনে ছুটতে থাকে।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য বিপরীত ব্যবস্থা কেন? আইন কি তাদের জন্য আলাদা? তাহলে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যাঁরা জীবনধারনের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন এবং সততার সাথে সেই ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই নির্দেশিকা তাদের উদ্দেশে কোন বার্তা দিল? ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ ও পুঁজিপতি প্রতারকদের গায়েব করা টাকার চাপে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ক্রমাগত লোকসানের সামনে পড়ছে, অথচ কিছুদিন আগেই তারা ছিল বিরাট লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার একাধিকবার এই ক্ষতি পূরণ করতে সরকারি কোষাগার থেকে ব্যাঙ্কের তহবিলে টাকা ঢেলেছে। যা আসলে সাধারণ মানুষের দেওয়া করের টাকা।

ব্যাঙ্কের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পেট্রল-ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো থেকে শুরু করে জিএসটি বাড়ানো, একশো দিনের কাজ সহ সমস্ত জনকল্যাণমূলক খাতে খরচ কমানোর পথে হাঁটছে বিজেপি সরকার। এ ভাবেই মালিকদের ব্যাঙ্কলুঠের বোঝা কৌশলে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিজেপির ভাণ্ডারে প্রাকাশ্যে ও গোপনে কর্পোরেট পুঁজির মালিকরা কেন এত বিপুল টাকা ঢালে। তা হলে প্রধানমন্ত্রী যে 'না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা' স্লোগান তুলেছিলেন, এই বোধহয় তার আসল রূপ!

বাস্তবে একচেটিয়া পুঁজিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে নরেন্দ্র মোদি সরকার এমনি করেই বারেবারে নিয়ম নীতি আইন বদলে দিয়েছে। মোদি সরকারের এই কাজকে সাংবাদিকরাও 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' বা স্যাঙাৎতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলছেন। বোঝা দরকার, আজকের দিনে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই স্যাঙাৎতন্ত্রের রূপ নিয়েছে। সরকার এবং রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের স্বার্থেই কাজ করলেও একটা ভাগরেখা এর মধ্যেও ছিল। এখন সরকার, রাষ্ট্র আর একচেটিয়া মালিকদের মধ্যেকার এই সীমারেখাটুকুও মুছে গেছে। আজ পুঁজিপতিরাই সরকার, তারাই আইন, তারাই সবকিছু। আগে যেটুকু নিয়ম-নীতির প্রশ্ন ছিল আজ সে বালাই আর নেই। আইন-কানুন সব কিছুকেই একেবারে খোলাখুলি মালিক শ্রেণির পায়ে বিসর্জন দিচ্ছে সরকার ও রাষ্ট্রের কর্তারা। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এ দেশের সব সরকারই পুঁজিপতিদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করে। বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি সরকার সেই দাসত্বের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, চক্ষুলজ্জার বালাইটুকুও তারা রাখছে না।

(তথ্যসূত্র ঃ দ্য ওয়্যার, ১৬.০১.২০২৩ এবং দ্য টেলিগ্রাফ ১৫.০৬.২০২৩)

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলায় এস ইউ সি আই (সি) দলের সংগঠক কমরেড অমর রায় ৪ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। কমরেড অমর রায় ষাটের দশকে কমরেড মাধব রায়চৌধুরী এবং কমরেড প্রাণগৌর বসাকের মাধ্যমে দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দলের বিস্তারের প্রথম দিকে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা ছিল তাঁর। দলের নির্দেশে জেলার বাইরেও গিয়েছেন তিনি। ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

তত্ত্বচর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল। চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পেত তাঁর পরিচালিত 'ভাবী যুগ' নামে সমাজ সচেতন দেওয়াল পত্রিকায়। মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার ও পাশে থাকার চেষ্টা করতেন। তাঁর জীবনধারা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। পরবর্তী জীবনে দলের কোনও নির্দিষ্ট দায়িত্বে না থাকলেও জুনিয়র কর্মীদের নেতৃত্বে হাসিমুখে কাজ করেছেন। কোভিডে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর মরদেহ ৫ জুন দলের জেলা অফিসে আনা হলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষালের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, জেলা নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড অমর রায় লাল সেলাম

মণিপুরে মেডিকেল ক্যাম্প

একের পাতার পর

স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেন জঙ্গিদের হাত থেকে স্থানীয় মানুষকে রক্ষার বদলে সিআরপিএফ নিরীহ মানুষের উপরই গুলি চালাচ্ছে। তাঁরা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনীর নানা অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্বহারা মানুষদের জন্য আশেপাশের এলাকা থেকে পোশাক সংগ্রহ করে দেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরাই। দেখা যায় দাঙ্গা যতই হোক মানুষ মানুষের পাশে আছে।

ইংগৌরকে মেইতেইদের প্রাচীন বিশ্বাসের সানামাহি মন্দিরের শিবিরে কুকি জনগোষ্ঠীর মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরাই তাঁদের দেখভাল করছেন। এমএসসি-র স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে নিজেদের সমস্যা তুলে ধরেন স্থানীয় মানুষ। তাঁরা বলেন, দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করা কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। তাঁদের উপলব্ধি, এই জাতিদাঙ্গা কারও ভাল করবে না।

রাজ্যের পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ হতে থাকায় ক্যাম্প চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমএসসি-র স্বেচ্ছাসেবকরা ২৯ মে ইম্ফলের জওহরলাল নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের হাতে বাকি ওষুধ তুলে দিয়ে গৌহাটি ফেরেন। স্বেচ্ছাসেবকদের অভিজ্ঞতা হল, কুকি এবং মেইতেই উভয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ দাঙ্গা না চাইলেও দুই পক্ষের ক্ষমতালোভী কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী রক্তপাত চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি দলেরও তাতে মদত রয়েছে।

ইম্ফল, মণিপুর

ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে গড়তে হবে নতুন লড়াই

কিছুদিন আগে খুব ধুমধাম করে হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন হয়েগেল। অনেক রেলওয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 'জয় শ্রীরাম' আর 'ভারতমাতা কি জয়' ধ্বনির উন্মাদনা গড়ে তোলার জন্য। সেই ট্রেনে সওয়ার হয়েছিলেন বিজেপি-র সাংসদ-বিধায়করা। রেল হাসপাতাল খালি করে ডাক্তার থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল স্টেশনে স্টেশনে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বন্দে ভারতের যাত্রার সূচনা হল। অভিভাবকদের গভীর উদ্বেগে রেখে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ফিরল রাত দেড়টা-দুটোয়, যাদের অধিকাংশেরই ওই ট্রেনে চড়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই।

বন্দে ভারতের প্রচারের মাধ্যমে জাঁকজমক, চাকচিক্য আর জাতীয় উন্মাদনা গড়ে তোলাই লক্ষ্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। গোটা ভারতে রক্তজালিকার মতো বিস্তৃত রেলব্যবস্থা তথা 'লাইফলাইন অফ ইন্ডিয়া'র সংবহনতন্ত্রে রক্ত সরবরাহে প্রবল ঘাটতি কিন্তু তাতে ঢাকা পড়ছে না। নতুন রেলপথ চালু করার বদলে পুরনোগুলি বন্ধ করা শুরু হয়েছে। অলাভজনক আখ্যা দিয়ে বহু ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক ভাড়াবৃদ্ধির মতলবে বহু প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা আঁটা হয়েছে। ১১৯টি রুটের ১৫১ জোড়া ট্রেনকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। দেড়শোর বেশি স্টেশন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালানোর জন্য ব্যক্তিমালিকের কাছে জলের দরে বিক্রি করা হয়েছে। রেলের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ হেক্টর জমি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেলকর্মীর সংখ্যা সাড়ে বাইশ লক্ষ থেকে কমে বারো লক্ষেরও নীচে নেমে গেছে। সমস্ত টিকিট কাউন্টার বন্ধ করে শতকরা একশো ভাগ অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই রেলের নিরাপত্তা-বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলির সমস্ত শূন্য পদ অবলুপ্ত করে দেওয়া হবে। দেশের সাধারণ মানুষের টাকায় গড়ে তোলা এই বৃহৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদের যদি এইভাবে বেসরকারিকরণ হতে থাকে, তা হলে খুব বেশি দেরি নেই যখন যখন খাঁ-খাঁ করবে রেলের হাজার হাজার কারখানা ও স্টেশন চত্বরগুলি। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে প্রাণচঞ্চল সমস্ত রেল কলোনি।

১৮৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রেল আয়তনে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম পরিবহন ব্যবস্থা। আজও রেলকর্মীরা ছাড়াও জীবিকার জন্য রেলের উপর নির্ভর করেন আরও কয়েক লক্ষ মানুষ। এ হেন ভারতীয় রেলকে বেসরকারি একচেটিয়া মালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকারগুলি। এই সর্বনাশ রুখতে প্রয়োজন রেল-কর্মচারী ও রেল-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ও লাগাতার আপসহীন আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনকে সফলতায় পৌঁছে দিতে চাই সঠিক নেতৃত্ব।

লড়াই-আন্দোলন রেল-কর্মীদের কাছে নতুন নয়। ১৯৭৪ সালে গোটা দেশের প্রায় ২০ লক্ষ রেলকর্মী ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত করেছিলেন এক ঐতিহাসিক আন্দোলন। নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ২০ দিন ধরে ধর্মঘট চালিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু শুধুমাত্র সঠিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, কিংবা বলা ভাল, আপসমুখী নেতৃত্বের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় সেই আন্দোলন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। সেই গৌরবময় আন্দোলনের ৫০ বছর পরে আজ যদি রেলকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে রেলকর্মীদের সংগঠিত আন্দোলন প্রয়োজন। তার জন্য ১৯৭৪-এর সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের ইতিহাস জানা জরুরি।

রেলকর্মীদের দখলে ট্রেন। ১৯৭৪

ধর্মঘটের প্রেক্ষাপট

১৯৪৭-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশ জুড়ে ভারী শিল্প গড়ে তোলা থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ, সবেতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ভারতীয় রেল। কিন্তু বেতন কম থাকায় বরাবরই ক্ষোভ ছিল রেল-কর্মচারীদের। ১৯৬০-এর দশকে রেলের আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কর্মীদের বেতন বাড়েনি। এদিকে '৭০-এর দশকে সমস্ত ভোগ্যপণ্যের বিপুল মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। চাল, গম, ভোজ্য তেল, কেরোসিনের আকাশছোঁয়া দামে কর্মীদের যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, তখন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার রেলকর্মীদের মাসিক বেতন সামান্য বাড়িয়ে ঘোষণা করে, তাঁদের পাওনা মহার্ঘভাতা কয়েকটি দফায় দেওয়া হবে। শুধু কম বেতন নয়, ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য অনুসারে রেলের উচ্চপদস্থ অফিসারদের জন্য বিলাসবহুল জীবন কাটানোর ব্যবস্থা থাকলেও বহু জায়গাতেই সাধারণ কর্মীদের কোয়ার্টারগুলি ছিল ভাঙাচোরা, বাসের অযোগ্য। অনেক সময়ই সেখানে বিদ্যুৎ থাকত না। এ নিয়েও ক্ষুব্ধ ছিলেন কর্মীরা।

কর্তৃপক্ষের কাছে কর্মীদের ক্ষোভ, দাবি-দাওয়া পৌঁছে দেওয়া, আন্দোলন সংগঠিত করে সেগুলি আদায় করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুমোদিত দুই প্রধান কর্মচারী সংগঠন এআইআরএফ (অল ইন্ডিয়া রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন) এবং এনএফআইআর (ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়েমেন)-এর নেতৃত্বের আপসমুখী আচরণে কর্মীরা ক্রমাগত তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। এনএফআইআর সংগঠনটি ক্ষমতাসীন কংগ্রেস প্রভাবিত হলেও এআইআরএফ-এর নিয়ন্ত্রণ ছিল সোসালিস্ট পার্টি এবং সিপিআই, সিপিআইএম-এর মতো তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির হাতে। তা সত্ত্বেও এনএফআইআর-এর মতোই এআইআরএফ-এর নেতৃত্বও রেল কর্তৃপক্ষের প্রতি ছিল নিতান্ত অনুগত এবং আন্দোলনবিমুখ। বড় ইউনিয়নগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ রেলকর্মীরা '৬০-এর দশকে বিভিন্ন বিভাগে আলাদা আলাদা সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন। এরকমই একটি সংগঠন এআইএলআরএসএ (অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন) তৈরি হয়েছিল ১৯৭০-এর আগস্ট মাসে। ইঞ্জিনের চালক, সহকারী চালক, ফায়ারম্যান ইত্যাদি লোকো-কর্মচারীরা ছিলেন চরম অত্যাচারিত। অনেক সময় ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা একনাগাড়ে কাজ চালিয়ে যেতে হত তাঁদের। ফলে অসুস্থতা ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কাজের সময় কমানোর দাবিতে এআইএলআরএসএ-র ডাকে '৭৩ সালের ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন ৫০ হাজারেরও বেশি লোকো-চালক। আন্দোলনের চাপে রেলমন্ত্রী তাঁদের কাজের সময় কমিয়ে ১০ ঘন্টা করতে এবং ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেই সময় রেলে দু'লাখেরও বেশি নিতান্ত কম মজুরির অস্থায়ী কর্মী ছিলেন সমস্ত শ্রম-অধিকার থেকে বঞ্চিত। অসুস্থ হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে বিনা বাক্যব্যয়ে এঁদের ছাঁটাই করে দিত কর্তৃপক্ষ, সামান্য ক্ষতিপূরণটুকুও মিলত না।

এগুলি ছাড়াও পদোন্নতি সংক্রান্ত কিছু অন্যায় নিয়ম এবং বোনাস না পাওয়ায় রেলকর্মীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ জমা হয়েছিল। ক্ষোভের জমা বারুদে আগুন দিয়েছিল খাদ্যশস্য ও কেরোসিনের আকাল, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, সরকার ও প্রশাসনের স্তরে স্তরে দুর্নীতি এবং সর্বোপরি, সেই সময়ে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও দেশে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রবল জোয়ার। এই সবকিছুই ১৯৭৪-এর ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

ধর্মঘটের প্রস্তুতি

'৭৩-এ লোকো-কর্মচারীদের আন্দোলন ও দাবি আদায় রেল-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। '৭৪-এর শুরু থেকেই দক্ষিণ-মধ্য রেল ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ-আন্দোলনে সামিল হন কর্মচারীরা। এখানে ওখানে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মী-বিক্ষোভে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। কর্মীদের সংগ্রামী মেজাজ দেখে ১৯৭৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে একটি জাতীয় কনভেনশনের ডাক দেয় ইউনিয়নগুলি। ১১০টি অনুমোদিত ও অননুমোদিত ইউনিয়ন যোগ দেয় এই কনভেনশনে। সেই সময়ে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ ছিলেন ইউটিইউসি-লেনিন সরণি (বর্তমানে এআইইউটিইউসি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি। তাঁর উদ্যোগে ইউটিইউসি-লেনিন সরণিও এই কনভেনশনে অংশ নেয়। প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক এবং এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দ। কনভেনশন থেকে সোস্যালিস্ট পার্টির জর্জ ফার্নান্ডেজকে আহ্বায়ক করে তৈরি হয় ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর রেলওয়েমেন্স স্ট্রাগল (এনসিসিআরএস) এবং সিদ্ধান্ত হয়, রেলমন্ত্রক যদি ১০ এপ্রিলের মধ্যে ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনায় না বসে তাহলে কর্মীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করবেন। একটি অ্যাকশন কমিটিও তৈরি হয়, যার সদস্য ছিলেন সিপিআই প্রভাবিত এআইটিইউসি ও সিপিএম প্রভাবিত সিটুর বেশ কয়েকজন নেতা সহ আরও কয়েকজন। কনভেনশনের প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুরু করে ধর্মঘটের প্রতিটি স্তরে, কমরেড শিবদাস ঘোষের দিকনির্দেশে ইউটিইউসি-এলএস এবং এসইউসিআই(সি)-র নেতা-কর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি, যা এই আন্দোলনের পরবর্তী গতিপ্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে। বিভাগীয় ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে আলাদা করে আন্দোলনের বদলে সর্বসম্মত কর্মসূচির ভিত্তিতে সমস্ত ইউনিয়নকে একজোট করে রেলশ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল করার জন্য কমরেড প্রীতীশ চন্দ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। পরে জর্জ ফার্নান্ডেজ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। দিল্লির কনভেনশনে যে এনসিসিআরএস গঠিত হয়, তাতেও কমরেড চন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন, বিভিন্ন বিভাগীয় ইউনিয়ন সহ রেলের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ইউটিইউসি-লেনিন সরণির উপস্থিতি ও কাজ ছিল। দিল্লির কনভেনশনেও কমরেড চন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এনসিসিআরএস-এর বডিতে কোনও মতেই ইউটিইউসি-লেনিন সরণির কোনও প্রতিনিধিকে জায়গা দেওয়া হয়নি এবং জানা যায়, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা এসেছিল সিটু এবং এআইটিইউসি-র পক্ষ থেকে। তবে রেলকর্মীদের মধ্যে এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করতে না পেরে অ্যাকশন কমিটির বৈঠকগুলিতে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কমরেড চন্দকে যোগ দিতে বলা হয় এবং তিনি প্রতিটি বৈঠকে উপস্থিত থেকে কার্যকরী নানা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যেগুলির আন্দোলনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সোসালিস্ট পার্টি, সিপিআই ও সিপিএম প্রভৃতির আপসকামী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাই তারা ইউটিইউসি-এলএল-এর প্রস্তাবগুলির রূপায়ণে বাধা দিচ্ছিল প্রবল ভাবে।

ধর্মঘটের ঘোষণা

ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আলোচনার সদিচ্ছা না দেখালে ৮ মে থেকে ধর্মঘট শুরু করা হবে বলে এনসিসিআরএস সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মর্মে ২৩ এপ্রিল সরকারের কাছে নোটিস পাঠানো হয়। চাকরি হারানো সহ শাস্তির নানা ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও শুরু থেকেই বঞ্চিত রেলকর্মীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব ছিলেন। এই অবস্থায় সরকার ২ মে আচমকা ফার্নান্ডেজ সহ আন্দোলনের কয়েকজন নেতাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

শুধু লড়াই থেকেই চরিত্র গঠন হয় না

কমরেড শিবদাস ঘোষ

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রদায়ের নামে, জাতপাতের নামে, ধর্মের নামে এবং প্রাদেশিকতার নামে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য, চালাকির মাধ্যমেই তারা এই কাজটিকে সম্পন্ন করেছে। কিন্তু মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের নামে শপথ নেওয়া এই নামধারী কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেননি। আর তাঁরা এটা করবেনই বা কী করে? তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা যেমন দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, তেমনি তাঁরাও তো বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট। তাঁরা যদি প্রকৃত কমিউনিস্ট হতেন এবং তাঁদের পার্টি যদি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হত, তা হলে তাদের দ্বারা এটা করা হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, কখনও আপনাদের মনে এই কথা এসেছে কি যে, ওই নেতৃত্ব যাঁরা নাকি সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং অবিবেচক, যাঁরা বুদ্ধিহীনদের মতো ব্যবহার করেছে, তাঁরা আপনাদের উচ্ছন্নের পথে নিয়ে গেছে?

দ্বিতীয়ত, কখনও আপনারা ভেবেছেন কি যে, এই উথালপাথাল পরিস্থিতিতে আপনাদের দায়িত্ব কী ছিল, আপনাদের কর্তব্য কী ছিল? একবারও কি আপনাদের মনে এসেছে, তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের এ হেন কার্যকলাপের পিছনে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ, ছিল নিজেদের ভবিষ্যৎকে গুছিয়ে নেওয়ার ধান্ধা? আপনারা জানেন, তাঁরা আজও বড় বড় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। কেউ মন্ত্রী হয়েছেন, কেউ পার্লামেন্টে গিয়েছেন, বিধানসভায় গিয়েছেন, কেউ বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়োচ্ছেন, কেউ বিলেত যাচ্ছেন, কেউ আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বাণী দিচ্ছেন, কাগজে তাঁদের ফটো ছাপা হচ্ছে এবং কারোর গলায় মালা চাপিয়ে আপনারা 'জিন্দাবাদ' করছেন। বিখ্যাত নেতা হয়ে সমাজের মাথার উপরে বসে তাঁরা তাঁদের রাজনীতির দ্বারা মানুষকে শোষণ করবার একটা রাস্তা পেয়ে গিয়েছেন। আর এটাই তো ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

শোষণ কি কেবল শিল্প (ইন্ডাস্ট্রি) আর ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই হয়, রাজনীতির মাধ্যমে হয় না? শোষণের অনেক পথ আছে। আইএনটিইউসি, এইচএমএস এবং কংগ্রেস-এর নেতারা কী করছেন? তাঁরা কি রাজনীতির মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণ করছেন না?

সব সময়ে মনে রাখবেন, সাধারণভাবে আন্দোলন দু'টি ভিন্ন রাস্তায় আমাদের নিয়ে যেতে পারে। সঠিক পথে পরিচালিত হলে আন্দোলন আমাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারে, কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত হলে এ আমাদের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে। বিপ্লবের পথ বড়ই জটিল, এই পথে চলা সহজ নয়। এই পথে ভুল হোক তাতে অসুবিধা নেই। ভুল থেকে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা নিতে হবে, তাকে শুধরে নিতে হবে। কিন্তু ভুল হয়েছে বলে এবং বিপ্লবী পথের জটিলতা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সংগ্রাম ও আদর্শকে পরিত্যাগ করবেন না। আদর্শকে আরও সমৃদ্ধ করুন, বাস্তবসম্মত করুন যাতে তা কর্মোপযোগী হয়, সঠিক হয়, কাল্পনিক না হয়ে যায়— এটাই সব থেকে বড় কথা। শুধুমাত্র সংগ্রামই সব নয়। কেবলমাত্র লড়াই থেকেই চরিত্র গঠন হয় না। যদি শুধু লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই চরিত্র তৈরি হত এবং তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত, তা হলে আমি জিজ্ঞাসা করি, অতীতের যে সমস্ত সংগ্রামী নেতারা পরবর্তীকালে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা কি কম সংগ্রাম করেছিলেন? ভারতবর্ষে বহু সংগ্রাম হয়েছে, তা কি এই সমস্ত নেতাদের চরিত্রকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে?

তথাকথিত কমিউনিস্ট, এইসব বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট কি বিপ্লবকে সঠিক দিশা দেখাতে পেরেছে? ভুলে যাবেন না, লড়তে লড়তেই এঁরা শোধনবাদী হয়েছেন, আত্মসর্বস্ব সুবিধাবাদী নেতায় (পলিটিকাল কেরিয়ারিস্ট) পরিণত হয়েছেন। আন্দোলন প্রয়োজন, আন্দোলন ছাড়া বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি হয় না— এ কথা ঠিক। কিন্তু মূল কথা হল— আন্দোলন যদি সঠিক রাস্তায় পরিচালিত না হয়, সঠিক চিন্তার ভিত্তিতে না হয়, তা হলে সেই আন্দোলন আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। তাই বলছি, অন্ধের মতো শুধু 'লড়াই-লড়াই' বলে চিৎকার করলেই হবে না।"

'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যার কয়েকটি দিক'

শিবদাস ঘোষ রচনাবলি, ৫ম খণ্ড

মালদায় কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকীতে সভা

এআইইউটিইউসি মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৩ জুন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী, এআইইউটিইউসি'র প্রয়াত সভাপতি ও শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা হয়। মালদা কলেজ অডিটরিয়ামে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোটরভ্যান চালক, টোটো চালক, মিড ডে মিল কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, আশাকর্মী সহ বিভিন্ন স্তরের চার শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী গভীর মনোযোগ সহকারে আলোচনা শোনেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

বক্তব্য রাখেন কমরেড গোপাল নন্দী। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুধর মণ্ডল।

'ভারতের বামপন্থী আন্দোলন ও শিবদাস ঘোষ' শীর্ষক আলোচনা সভা পাণ্ডুয়ায়

এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে হুগলির পাণ্ডুয়ার শশীভূষণ সাহা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২ জুন এক আলোচনা সভা হয়।

'ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন ও শিবদাস ঘোষ' বিষয়ে আলোচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন দলের হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্মেলনে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন ১৭ জুন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে। সম্মেলনে রাজ্যের দুই শতাধিক সরকারি চিকিৎসক অংশ নেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ বিজ্ঞান বেরা প্রমুখ।

বক্তারা চিকিৎসকদের বদলি-পদোন্নতি-পোস্টিং নিয়ে যে সীমাহীন দুর্নীতি চলছে তার বিরুদ্ধে সরব হন। কাজের জায়গায় চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও গ্রুপ-ডি, সুইপার সহ ডাক্তার নার্সদের সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে বক্তারা সোচ্চার হন। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়। ডিএ সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধেও সম্মেলনে বক্তারা সোচ্চার হন।

সম্মেলনে ইএনটি অপারেশনে বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক ডাঃ সুদীপ দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তীকে সভাপতি, ডাঃ সজল বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক, ডাঃ স্বপন বিশ্বাসকে কোষাধ্যক্ষ করে পঁচাশি জনের শক্তিশালী রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসকরা

মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজধানী ভোপালে ৬-৮ জুন এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির হয়। শিবিরে দু'শোর বেশি নেতা-কর্মী যোগ দেন। পরিচালনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ সামল। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্ক্সবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে' এবং 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক' বই দুটি নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। শেষ দিন কমরেড সামল নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে এবং সমাপনী সমাবেশে সামিল করতে আবেদন করেন। পার্টিকে রাজ্যের সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও তিনি নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানান।

মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা

এস ইউ সি আই (সি)-র শুভেচ্ছা বার্তা

একের পাতার পর

গণবিক্ষোভ আছড়ে পড়ছে। কিন্তু সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি বা শক্তি যারাই একমাত্র এই সব আন্দোলনগুলিকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, তারা অনুপস্থিত থাকার ফলে আন্দোলনগুলি কিছু দূর গিয়ে থিতিয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজয় পরবর্তী দুনিয়ায় এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয় এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শুরু হয় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন। মহান মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চিন বিপ্লবের সাফল্য বিশ্বের সকল কমিউনিস্ট পার্টি ও শক্তিগুলিকে আরও প্রেরণা দেয়। এই পটভূমিতেই ১৯৫৩ সালে মহান স্ট্যালিনের জীবনাবসান ঘটে যায়। তারপরই আসে ১৯৫৬ সালে রেনিগেড ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস— যেখানে ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা হয়। সেই সময়ই আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে এই স্ট্যালিনবিরোধী আক্রমণের দ্বারা সাম্যবাদী আন্দোলনে স্ট্যালিনের অথরিটিকেই খাটো করা হচ্ছে, যা কার্যত লেনিনকেই অস্বীকার করা হয়ে দাঁড়াবে, লেনিনবাদের বিপ্লবী শিক্ষাগুলিকে ধ্বংস করবে, যা কালক্রমে আদর্শগত ভাবে শোধনবাদের জোয়ার সৃষ্টিতেই সাহায্য করবে। এই শোধনবাদী জোয়ারই শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চিনে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়েছে। কিন্তু আমাদের পার্টির উপযুক্ত শক্তি না থাকার জন্য বিশ্বের কমিউনিস্টদের এই হুঁশিয়ারি আমরা শোনাতে পারিনি।

এখন আমরা সকলেই জানি, শোধনবাদী আক্রমণের পরিণামে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে কী বিপর্যয় নেমে এসেছে, কী ভাবে তা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু আশার কথা এই যে, বিশ্বের বহু দেশেই আবার কমিউনিস্ট পার্টি ও নানা গোষ্ঠী নতুন করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতিতে তার সঠিক প্রয়োগের ভিত্তিতে মেহনতি মানুষকে সঠিক দিশা ও পথনির্দেশ দেখানোর মধ্য দিয়ে একটি শক্তি হিসাবে এরাই উঠে দাঁড়াবে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা দুই পার্টি একত্রে কাজ করতে চাই। আমাদের মধ্যে মতবিনিময় চলতে থাকুক। আপনাদের পুস্তক-পুস্তিকা, বিবৃতি এবং দশম কংগ্রেসে গৃহীত দলিলগুলি আমাদের পাঠাবেন। আমরাও আমাদের পত্রপত্রিকা ও প্রকাশনা আপনাদের পাঠাব।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

পঞ্চায়েত নির্বাচন

একের পাতার পর

আচরণে আর একবার তা মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর রাজ্য নির্বাচন কমিশন! তারা নাকি কোনও হত্যার খবরই পায়নি! অন্য দিকে পুলিশ বুক ফুলিয়ে ৬২টা বোমা উদ্ধারের বড়াই করেছে! অথচ শুধু ভাঙড়েই মানুষ মিনিটে মিনিটে বোমা পড়তে দেখেছে, কয়েক শত বন্দুকধারীকে তাঁরা দাপাতেও দেখেছে। নানা এলাকার সন্ত্রাসের ছবি টিভি থেকে মোবাইলের স্ক্রিন কিংবা খবরের কাগজ, সর্বত্রই ঘুরছে। শুধু পুলিশ আর নির্বাচন কমিশন তা জানে না! বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের মতো বিরোধীরা কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে কি থাকবে না তাই নিয়ে সরকারের সাথে তরজাতেই ব্যস্ত। এখনই সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, এই দাবিটাই পিছনে চলে যাচ্ছে।

সংবাদমাধ্যমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙড়, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার নাম বেশি এসেছে। কিন্তু আসেনি সেইসব জায়গার কথা যেখানে বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন কেন্দ্রের কাছে ঘেঁষতেই বাধা দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও এসডিও-বিডিও অফিসে আপাত শান্তি বজায় থাকলেও বিরোধীদের সন্ত্রস্ত্র করতে গ্রামে গ্রামে চোখরাঙানি ছাড়াও শাসকদলের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে হামলা চালিয়েছে। এর পরেও মনোনয়ন তুলে নিতে ও ভোটের সময় সন্ত্রাসের রূপ কী হবে তা সময় বলবে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থীরা ক্যানিংয়ে মনোনয়ন দিতে গেলে তৃণমূলের বাহিনী তাদের মারধর করে কাগজপত্র কেড়ে নিয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কুলতলির মেরিগঞ্জে হেড়োভাঙাতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর অফিস পুলিশ এবং তৃণমূল একযোগে ঘিরে রেখে মনোনয়নে যেতেই বাধা দিয়েছে। মেরিগঞ্জ-১ এর যে সব গ্রামে এস ইউ সি আই (সি)-র সাংগঠনিক শক্তি বেশি সেখানে অস্ত্র উদ্ধারের নামে কৃষক পরিবারের ঘরে ঘরে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে যাতে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে এস ইউ সি আই (সি)-কে আটকানো যায়। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৬ জুন সমাজমাধ্যমে প্রচারিত এক বার্তায় বলেন, রাজ্য সরকার, শাসকদল এবং নির্বাচন কমিশন মিলে গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

সিপিএম সরকারের আমল থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচন মানেই মানুষ প্রহর গোনে আবার কত প্রাণ এবারে যাবে? ১৯৮০-র দশক থেকে প্রতিটি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়িতে বাড়িতে সাদা থান পৌঁছে দিয়ে হুমকির হিমশীতল পরিবেশ সৃষ্টি করাকে তৎকালীন শাসকদলের নেতারা প্রায় একচেটিয়া শিল্পে পরিণত করেছিলেন। প্রতি বছরেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের শেষে কোনও বছর ৭০, কোনও বছর ৩০-৪০ জনের মৃত্যু সংখ্যা গুনতে হত মানুষকে। একের পর এক বুথে বিরোধীরা শূন্য আর সিপিএম প্রায় সব ভোট পাওয়ার রেকর্ডের তখনই শুরু। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় বসার পর এই ভিত্তি থেকে শুরু করে নির্বাচনী সন্ত্রাসে সিপিএমের যথার্থ উত্তরসূরীর পরিচয় দিয়েছে। বিজেপি, যারা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র হত্যা নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা করে, তারাই ত্রিপুরায় সরকারে বসার পর সমস্ত পঞ্চায়েত বিরোধীশূন্য করার কর্মসূচি নিয়েছিল। শাসকদলগুলির নেতাদের বক্তব্যে অদ্ভুত মিল— আগে সিপিএম বলত বিরোধীরা প্রার্থী জোগাড় করতে না পারলে কি আমরা জেগাড় করে দেব? ত্রিপুরায় বিজেপি হুবহু এক কথা বলেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বলছে, কেউ মনোনয়ন দিতে যেতে ভয় পেলে আমাদের বলুন আমরা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করব। একটা প্রশ্নের উত্তর এরা কেউ কি দেবেন— মনোনয়ন জমা দিতে ভয়ের প্রশ্নটা উঠল কেন? এটাই তো প্রমাণ করে পরিস্থিতিটা আসলে কী হয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় যে দলই শাসকের আসনে বসছে তারাই যে কোনও ভোটে বিশেষত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব ক্ষমতা একা দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেন এমন হবে? নির্বাচন, বিশেষত পঞ্চায়েত নির্বাচন মানেই কি রক্তপাত-প্রাণহানি, বিরোধীদের ভোটে দাঁড়াতেই বাধা? তা হলে সংবাদমাধ্যমে আদর করে ভোটকে 'গণতন্ত্রের উৎসব' বলার মানে কী? এই যদি উৎসবের চেহারা হয়, গণতন্ত্র মানে যদি 'জোর যার মুলুক তার' হয়, তা হলে সে গণতন্ত্র থাকা আর না থাকায় মানুষের কী এসে যায়! এই প্রশ্নটা আজ উঠছে। পঞ্চায়েতী রাজ নিয়ে নানা গালভরা কথা বলে থাকেন কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের গদিতে নানা সময় বসা সব দলের নেতারাই। কিন্তু পঞ্চায়েত যে ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। গ্রামীণ মানুষের ক্ষমতায়ন নয়, পঞ্চায়েত আসলে আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দালালদের হাতে গ্রামীণ মানুষকে বন্দি করে রাখার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণির জোরালো হাতিয়ার। যে কাজগুলি প্রশাসনেরই করার কথা সেগুলিকেই পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে করানো হয়। নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও ক্ষমতা পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই কার্যত নেই। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পুঁজিবাদী শোষণের নাগপাশের বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলতেই না পারে, তা একেবারে গ্রামের পাড়া স্তর পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়। পঞ্চায়েতের ক্ষমতাসীন দল এবং তার নানা স্তরের নেতারা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে থাকেন। তাদের না জানিয়ে পরিবারের সামান্য কোনও সিদ্ধান্তও গ্রামীণ মানুষের পক্ষে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। এই প্রবল দাপটই সীমাহীন দুর্নীতিরও সুযোগ করে দেয়। গ্রামের সাধারণ মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েতী বাবুদের নানা ভাবে খুশি করতে হয়। শাসকদলের বিরুদ্ধে গেলে কোনও প্রাপ্যই মিলবে না। এ ছাড়াও নেতাদের খুশি করতে বহু ধরনের ভেট পৌঁছে না দিলে মানুষের ভাগে কিছুই পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম আমল থেকে জবকার্ড, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, গ্রামীণ মানুষের জন্য বরাদ্দ নানা সরকারি ঋণ এমনকি রেশন কার্ড পেতেও এই বাবুদের দুয়ারে ঘুরে ঘুরে হয়রান হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়নি এমন গ্রামীণ মানুষ বিরল। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের ওপর রাজনৈতিক দাপট বজায় রাখা এবং দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা লোটার স্বর্গরাজ্য এই দুইয়ের মেল বন্ধনই

আটের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

বন্ধ হবে কী করে

এখন একটা কথা তোলা হচ্ছে যে, সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্র কমে যাচ্ছে, সবাই বেসরকারি স্কুল পছন্দ করছে। সুতরাং সরকারি স্কুল বন্ধ করা হোক, সরকারি টাকার বাজে খরচ দরকার নেই। ভাবখানা এমন যেন, সরকার কোনও বাজে খরচই করে না। এই যে অজস্র দুর্নীতি, এতেই তো বিপুল টাকা নষ্ট হচ্ছে! একে আটকানোর চেষ্টা কোথায় সরকারের? অনেকে এমনও বলেন, সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে না।

সরকারি বিদ্যালয়ের ওপর মানুষ কেন এখন ভরসা রাখতে পারছে না, আগে তো পারত, এমনকি এখনও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে তারা তো সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে! এখন যে মানুষ প্রাইমারি বা মাধ্যমিকে বেসরকারি স্কুলের দিকে ছুটছে তার জন্য দায়ী কে? ভালো পরিকাঠামো, ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত যথাযথ রেখে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক দেওয়া, পাশ-ফেল প্রথা চালু, সঠিক পরিবেশ বজায় রাখা— এটা কার দায়িত্ব? জনগণের করের টাকা জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য খরচ করা হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তা না করে এত রমরমিয়ে বেসরকারি বিদ্যালয় গড়ে তোলার অনুমতি কে দেয়? সরকারই তো! ব্যবসা করার তো অনেক জায়গা আছে, চিকিৎসা, শিক্ষাক্ষেত্রগুলি ব্যবসায়ীদের হাতে না তুলে দিলে কি চলছিল না? ক'জনের ক্ষমতা আছে এই সুযোগ নেওয়ার? হয়তো কোনও রকমে সন্তানদের অনেক কষ্টে প্রাইমারিতে পড়াতে পারবে, তারপর? এখন সেমেস্টার পদ্ধতিতে পড়া মানে তো বারবার টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়া। চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হচ্ছে কোনও রকমের পরিকাঠামোর ব্যবস্থা না করেই। তাতে ছাত্রদের গুণগত শিক্ষা দেওয়া যাবে, না তা কম খরচে হবে?

শিক্ষার মতো হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্যক্ষেত্রকেও বেসরকারি মালিকদের হাতে বেচে দিচ্ছে সরকার। যে শিক্ষানীতি বা স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করার ফলে আজ সরকারি স্কুল এবং হাসপাতালের এই হাল, সেই নীতি গ্রহণের প্রশ্নে ভোটসর্বস্ব দলগুলোর কোনও পার্থক্য আছে কি?

মানুষ কঠিন পবিশ্রম করে যে আয় করছে, তা বেশিরভাগ খরচ হচ্ছে চিকিৎসা ও শিক্ষা কিনতে। এই যে সর্বত্র দেশের রাজনীতিবিদদের সাথে পুঁজির মালিকদের যোগসাজশ চলছে, যার ফল ভোগ দেশের সাধারণ মানুষকে করতে হচ্ছে তা বন্ধ হবে কী করে?

গৌতম দাস, মালদা

ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর

তিনের পাতার পর

গ্রেফতার করলে পরদিনই এর প্রতিবাদে দিল্লি ও বোম্বেতে রেলকর্মীরা বনধ ডাকেন। মধ্য ও পশ্চিম রেল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস সহ সমস্ত সরকারি দফতর বন্ধ হয়ে যায়।

কর্মীরা আপসহীন লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকলেও শুরু থেকেই নেতৃত্ব আপসের পথে চলতে শুরু করে। তাঁরা প্রথম থেকেই এমন মনোভাব প্রকাশ করেন যে, হয়তো ধর্মঘট করতেই হবে না, যদি একান্তই করতে হয়, তাহলে তা অল্প কয়েকদিনের বেশি স্থায়ী হবে না। তাই ২ মে-র গ্রেফতারির পর থেকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে ধর্মঘট শুরু হলেও ইউনিয়নের নেতারা সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে ধর্মঘটের ডাক না দিয়ে ৮ মে থেকে ধর্মঘট শুরুর ডাক দেন। সরকার এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মঘট মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিয়ে নেয়। আপসকামী দোদুল্যমান নেতৃত্বের স্বরূপ চিনতে ভুল হয়নি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের। তাই, গোটা দেশের প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা রেল স্তব্ধ হয়ে গেলে কতখানি চাপের সামনে সরকারকে পড়তে হতে পারে তা জানা থাকা সত্ত্বেও এবং এই আন্দোলনের পিছনে বিপুল জনসমর্থন আছে জেনেও সরকার ধর্মঘট দমনে কড়া পদক্ষেপ নিতে সাহস করে।

ধর্মঘটের দিনগুলি

৮ মে শুরু হয় ধর্মঘট। গোটা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা রেলপথগুলি নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। প্রায় ২০ লক্ষ রেলকর্মী ধর্ম-বর্ণ-জাত-ভাষা নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে স্তব্ধ করে দেন গোটা দেশের পরিবহন ব্যবস্থা। মুম্বাই, চেন্নাই, নিউ দিল্লি, গুয়াহাটি, হাওড়া, শিয়ালদহ, খড়্গপুর, আদ্রা সহ রেলের প্রধান কেন্দ্রগুলি ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায়। কাঁচরাপাড়া, জামালপুর, পেরুমবুর, চিত্তরঞ্জন সহ রেলওয়ে কারখানাগুলি জনমানবহীন হয়ে পড়ে থাকে।

৮ মে ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগে থেকেই জায়গায় জায়গায় আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করেছিল কংগ্রেস সরকার। দিনে দিনে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হতে থাকে। ধর্মঘটী রেলকর্মী এমনকি তাঁদের পরিবার-পরিজনের উপর সরকার নির্মম উৎপীড়ন চালাতে থাকে। রেলমন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্র হুমকি দেন, ধর্মঘটীদের বরখাস্ত করা হবে। তা সত্ত্বেও ধর্মঘটে অটল থাকেন রেলকর্মীরা। ১৫ মে দেশ জুড়ে সরকারি কর্মচারীরা এই আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হন। বম্বেতে বিদ্যুৎ, পরিবহন দফতর এমনকি ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা রেলকর্মীদের আন্দোলনে ভাগ নিয়েছিলেন। পেরামবুরে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরির ১০ হাজারের বেশি শ্রমিক চেন্নাইতে মিছিল করে গিয়ে ধর্মঘটে সংহতি জানিয়েছিলেন। শুধু ভারতের মেহনতি মানুষই নন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের শ্রমিকরাও ভারতের রেল-কর্মীদের এই আন্দোলনে সংহতি জানান ও চিঠি লিখে সরকারকে অনুরোধ করেন তাঁদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে। শুধু রেলের শ্রমিক-কর্মচারীরাই নন, মহিলা-শিশু নির্বিশেষে তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও একযোগে আন্দোলনে সামিল হন। তৎকালীন মাদ্রাজে ১ হাজার মহিলা ও শিশু ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করে। ত্রিচিতে এমন মিছিলে যোগ দেন প্রায় ২ হাজার নারী ও শিশু। মাদুরাইতে ১ হাজার মহিলার বিক্ষোভ মিছিল রেলের ডিভিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্টকে ঘেরাও করে এবং তাঁকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। রেল ধর্মঘটের কারণে চূড়ান্ত অসুবিধায় পড়া সত্ত্বেও কার্যত গোটা দেশের মানুষ রেলকর্মীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের ধর্মঘটকে সমর্থন করেন।

আন্দোলনকারীদের উপর চূড়ান্ত দমন-পীড়ন

সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে ওঠা রেলশ্রমিক-কর্মচারীদের এই অভূতপূর্ব আন্দোলন গায়ের জোরে দমন করার রাস্তা নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন তৎকালীন ইন্দিরা-কংগ্রেস সরকার। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে দমনপীড়নের যে নজিরবিহীন তাণ্ডব চালিয়েছিল তারা, তা যে কোনও স্বৈরাচারী ও বর্বর শাসককে লজ্জা দিতে পারে। রেল কলোনি ও শ্রমিক মহল্লাগুলিতে পুলিশ এবং বিএসএফ, সিআরপিএফ ইত্যাদির মতো আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এদের দিয়ে রেলকর্মীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ছাড়াও তাঁদের পরিজনদের উপর হামলা চালাতে ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়েছিল সরকার। শুধু মারধর, ভয় দেখানো নয়, আন্দোলনকারীদের বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত রাস্তায় টেনে এনে প্রায় বিবস্ত্র করে নারকীয় অত্যাচার চালানো হয়েছিল। রেল-কোয়ার্টার থেকে পুরুষ কর্মীটিকে গ্রেফতার করে পরিজনদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রায় ৫০ হাজার রেলকর্মচারীকে। অনেকের বিরুদ্ধে এমনকি 'মিসা'-র মতো চরম দমনমূলক আইনেও অভিযোগ দায়ের করা হয়। এছাড়া অপপ্রচার, ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি তো ছিলই। এত কিছু সত্ত্বেও সরকার যখন আন্দোলনকারীদের মনোবল ভাঙতে পারল না, তখন পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে কর্মীদের ধরে এনে জোর করে বন্ডে সই করিয়ে, বন্দুকের মুখে ফেলে তাদের দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করে। কোথাও কোথাও এমনকী ড্রাইভারদের কেবিনের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে ট্রেন চালানো হয়।

প্রথম থেকেই নেতৃত্বের আপসকামী আচরণ

প্রবল উৎপীড়ন সত্ত্বেও রেলকর্মীরা যখন অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন নেতৃত্বকারী তিনটি দলের ভূমিকাই ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। শুরু থেকে ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আন্দোলনের কোনও স্তরেই নেতৃত্ব গুরুত্ব সহকারে এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে চায়নি।

ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দোলনের প্রস্তুতির লক্ষ্যে দিল্লি সম্মেলনেই ইউটিইউসি-লেনিন সরণির পক্ষে কমরেড প্রীতীশ চন্দ এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সরকারের গতিপ্রকৃতি থেকে স্পষ্ট যে তারা প্রচণ্ড আক্রমণে রেল ধর্মঘট এবার ভাঙতে চাইছে। এই আন্দোলনে কঠিন লড়াই হবে ও তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ফলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার দিকে তাকিয়ে না থেকে কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার মানসিকতা তৈরি ও তার উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি নেওয়ার দিকে বার বার তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সরকারি অত্যাচারের মুখে পড়লে কর্মীরা যাতে নিজেদের মধ্যে ও নেতৃত্বের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতে পারেন, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেন তিনি। কিন্তু সম্মানজনক মীমাংসায় না আসা পর্যন্ত আন্দোলনকে ধাপে ধাপে শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপকতর করা এবং উন্নত রাজনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি আদৌ গড়ে তুলতে চায়নি নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত সোসালিস্ট পার্টি, সিপিআই ও সিপিএম— এই তিন দলের কোনও নেতাই। ফলে ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর নিজেদের মধ্যে, কিংবা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। ধর্মঘট শুরু হওয়ার পরেই এই দলগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাঁরা ইউনিয়নের নেতা, তাঁরা জেলে ঢুকে গিয়েছিলেন, বাকিরাও আত্মগোপনের এমন রাস্তা নিয়েছিলেন যে কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারেননি, কর্মসূচি স্থির করা দূরের কথা। ফলে সরকারি আক্রমণের সামনে কর্মীরা হয়ে পড়েন নিতান্ত অসহায়।

তা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্যোগে বহু জায়গাতেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সংগঠন ও নেতৃত্ব ঠিক থাকলে প্রায় বিশ লক্ষ রেলকর্মী ও তাঁদের পরিজন মিলে সত্তর লক্ষ মানুষ এই ধর্মঘটে যে মনোবল দেখিয়েছিলেন, তাতে প্রতিদিন উপযুক্ত কর্মসূচি নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারলে ১৯৭৪-এর রেল ধর্মঘট গণআন্দোলনকে অনেক বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত।

আপসের ফর্মুলা

এই আন্দোলন সম্পর্কে নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি আরও একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয়। ধর্মঘট শুরু হওয়ার মাত্র একদিন পরে ১০ মে প্রধানমন্ত্রী সহ পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সিপিআই, সিপিএম সহ বিরোধী দলের নেতাদের যে বৈঠক হয়, সেখানে রেলকর্মী ও সরকারের মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি 'থ্রি-পয়েন্ট ফর্মুলা'-র উদ্ভব হয়। এই ফর্মুলার মূল বক্তব্য ছিল নেতাদের মুক্তি, ধর্মঘট প্রত্যাহার ও আলোচনা নতুন করে আরম্ভ করা— এই তিনটি বিষয় নিয়ে, যা দেখলেই বোঝা যায়, ধর্মঘট আরম্ভের একদিন পর থেকেই কোনও মতে তা তুলে নিতে কতখানি ব্যগ্র ছিলেন নেতারা। এই ফর্মুলায় আন্দোলনকারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের কথা দূরে থাক, শাস্তিপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের প্রশ্ন, এমনকি জেলবন্দি সাধারণ রেলকর্মী বা ইউনিয়নের সাধারণ নেতাদের মুক্তির প্রসঙ্গটিও নেই। রয়েছে শুধু বড় নেতাদের মুক্তির কথা। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও উল্লেখ্য যে, সেদিনই দুপুরে এনসিসিআরএস-এর অ্যাকশন কমিটির বৈঠকে এই ফর্মুলা রিপোর্ট আকারে পেশ করেছিলেন সিপিএম নেতা সমর মুখার্জী। ১২ মে-র অ্যাকশন কমিটির বৈঠকে কমরেড প্রীতীশ চন্দ এই ফর্মুলার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এর মধ্যে দিয়ে নেতৃত্বের দুর্বলতা যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার বিরোধিতা করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের গাইডেন্সে একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাবে কমরেড চন্দ ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক দাবিগুলি সম্পর্কে সরকারের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দাবি করেন। ধৃত হাজার হাজার রেলকর্মী, অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মী সহ সকলের মুক্তি নিশ্চিত করা ও তাঁদের উপর দায়ের করা দমনমূলক ধারাগুলি প্রত্যাহারের দাবি তোলেন এবং এই প্রস্তাব গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করতে ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন তিনি। কিন্তু এই প্রস্তাবে ধর্মঘটে প্রধান তিনটি দলের কেউই

সাতের পাতায় দেখুন

ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর

ছয়ের পাতার পর

সেদিন কর্ণপাত করেনি।

কর্মীরা লড়তে তৈরি ছিলেন, নেতৃত্ব নয়

ধর্মঘটী রেলকর্মীরা যখন সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন তখন সরকারের সঙ্গে আপস-মীমাংসার রাস্তা না খুঁজে নেতৃত্বকারী দলগুলির উচিত ছিল সংগ্রামী রেলকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের মনোবল রক্ষা করা এবং বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির সমন্বয় ঘটানো। ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষক-ছাত্র-যুব-মহিলাদের গণসংগঠনগুলিকে যুক্ত করে জনসাধারণের সমর্থনকে সক্রিয় রূপ দিয়ে দেশ জুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলা। নেতৃত্বকারী দলগুলির সাংসদরা যদি অত্যাচারিত আন্দোলনকারী ও তাঁদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতেন এবং অত্যাচারী সরকারের স্বৈরাচারী চেহারা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেন, তা হলে পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের নিজস্ব প্রতিরোধব্যবস্থা থাকার কারণে, সরকার পিছু হটতে বাধ্য হত এবং এই ঐতিহাসিক আন্দোলন সাফল্য ছিনিয়ে আনতে পারত।

নেতৃত্বকারী দলগুলির আপসকামী চরিত্র

কিন্তু, এই রেল ধর্মঘটের নেতৃত্বে প্রধান তিনটি স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে যে এসপি, সিপিআই এবং সিপিএম, তারা নিজেদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই অসাধারণ আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে গণআন্দোলন পরিচালনার সঠিক বিজ্ঞানসম্মত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেনি।

এসপি একটি সুপরিচিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টি। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের স্লোগান তুলে এই দলটি সংসদীয় পদ্ধতিতেই আইন-কানুন পাল্টে সমাজতন্ত্র কায়েম করার কথা বলে। ফলে এই আন্দোলনে এসপি যে ভূমিকা পালন করেছে, তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক।

সিপিআই দলটি সেইসময়ে এক দিকে সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্বের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছিল, অন্য দিকে কংগ্রেসের প্রগতিশীল (!) ভূমিকা দেখে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মোর্চায় যুক্ত ছিল এবং ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়াদের হয়ে 'জাতীয় স্বার্থ'-এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছিল। ফলে ধর্মঘট শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরেই তাদের নেতা শ্রীপাদ ডাঙ্গে খোলাখুলি বলেছিলেন, রেলের মতো শিল্পে বেশিদিন ধর্মঘট চলতে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ তাতে 'জাতীয় স্বার্থ' বিপন্ন হয়ে পড়বে। শ্রেণিবিভক্ত এই রাষ্ট্রে তাঁদের 'জাতীয় স্বার্থ'-কে বিপন্ন হতে না দেওয়ার দুশ্চিন্তা যে দেশের মেহনতি জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার জন্য নয়, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বেল, শ্রেণি-সচেতন মানুষের তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী ইন্দিরা কংগ্রেসের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

১৯৭০-এর দশকে সিপিএম দলটির কর্মীদের মধ্যে কিছুটা সংগ্রামী বামপন্থী মেজাজ ছিল। তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী দল বলতেন, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা প্রচার করতেন। এই অবস্থায়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলতে যদি তাঁরা রাষ্ট্র-বিপ্লবকেই বোঝাতেন, তাহলে তো দেশের ভিতরে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনগুলিকে ব্যাপকতর করে, স্তরে স্তরে উন্নত করে সেগুলোকে উন্নত রাজনৈতিক চেতনার স্তরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা যাওয়া উচিত ছিল। রেল ধর্মঘট তাঁদের সামনে সেই সুযোগ চমৎকারভাবে এনে দিয়েছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা সিপিএম নেতৃত্ব করেননি। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে কমরেড প্রীতীশ চন্দ যখনই অ্যাকশন কমিটি বা ট্রেড ইউনিয়ন বৈঠকগুলিতে বার বার গণসংগঠনগুলিকে যুক্ত করে রেল ধর্মঘটকে ব্যাপকতর করার প্রস্তাব এনেছেন, সিপিআই নেতাদের সুরে সুর মিলিয়ে সিপিএমের পলিটবুরো সদস্য ও সিটুর সাধারণ সম্পাদক রামমূর্তি প্রতিবারই তার বিরোধিতা করেছেন। কোনও সময়েই রেল ধর্মঘটের সঙ্গে গোটা দেশের জনসাধারণের সমর্থনকে যুক্ত করে এই আন্দোলনকে বিস্তৃত করার কোনও উদ্যোগই তাঁরা নেননি। ১৫ মে তাদের প্রস্তাবিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকশনের প্রস্তাবের বদলে ইউটিইউসি-এলএস-এর পক্ষে ভারত বনধের প্রস্তাব দিলে ডাঙ্গের মতো করেই সিটুর রামমূর্তি বিরোধিতা করে কমরেড চন্দকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'রেল আন্দোলনের পরিধি ও গভীরতাকে বাড়াবেন না' (ডোন্ট অ্যাড ডাইমেনশন টু ইট)। শুধু তাই নয়, অর্থনীতির চূড়ান্ত বেহাল দশায় যখন দেশের মানুষ চূড়ান্ত বিক্ষুব্ধ, সেই সময় রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী আন্দোলনে সামিল হওয়ার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তাকে কাজে লাগাতে সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে যুক্ত করে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এস ইউ সি আই (সি) গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু এরও কার্যকরী বিরোধিতা করেছিল সিপিআই, সিপিএম।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, গণআন্দোলন পরিচালনায় এস ইউ সি আই (সি)-র আপসহীন চরিত্রের কারণেই এই ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এনসিসিআরএস-এ কমরেড প্রীতীশ চন্দকে জায়গা দেওয়া হয়নি, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, সিপিএম ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নের গরম বিপ্লবী বুকনিগুলি যে নেহাতই প্রতারণামূলক, এই দলটি সঙ্গে থাকলে বার বার তা জনসমক্ষে এসে যাবে। সেই ঝুঁকি নিতে চায়নি বলে সঙ্গত কারণেই এনসিসিআরএস-এ-র মধ্যে ইউটিইউসি-এলএস-কে অন্তর্ভুক্ত করার সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা এসেছিল সিটু এবং এআইটিইউসি-র কাছ থেকে।

ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা

১৬ মে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও অ্যাকশন কমিটির বৈঠকে কমরেড প্রীতীশ চন্দ আরও একবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন-নিবেদনের রাস্তা ছেড়ে সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে রেল ধর্মঘটের সমর্থনে দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার প্রস্তাব দেন। এবারও নেতৃত্বকারী দলগুলি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি দিল্লির আশপাশের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমবেত করে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থানের যে কর্মসূচিটি ইউটিইউসি-এলএস দিয়েছিল, সেটিও সিপিআই ও সিপিএম নেতৃত্ব শোনামাত্র খারিজ করে দেন। ইন্দিরা সরকারের মধ্যে সেই সময় তাঁরা নাকি আপস-মীমাংসার মনোভাব দেখতে পেয়েছিলেন! শুধু তাই নয়, এ দিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ১৭ মে পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইলে চূড়ান্ত অপমানজনক ভাবে তা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বিরোধী নেতাদের জানানো হয়, ধর্মঘট তুলে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ইন্দিরাজি কোনও আলোচনাই করবেন না।

এই ঘটনার পর থেকেই সিপিএম সহ পার্লামেন্টের সমস্ত বিরোধী নেতারাই ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে ব্যগ্র হয়ে পড়েন এবং তার জন্য যে কোনও উপায়ে একটি সূত্র বা ফর্মুলা বের করার জন্য হন্যে হয়ে চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁরা কখনও কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সাথে, কখনও কংগ্রেসের নানা স্তরের নেতাদের সাথে দেখা করে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এইভাবে রেল ধর্মঘট শক্তিশালী করার বদলে আপস-মীমাংসায় আসার জন্য আলোচনার ব্যবস্থার করতে নেতাদের যে মাত্রাতিরিক্ত ব্যগ্রতা ছিল, তা দেখে এবং নেতাদের আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠা দুর্বলতা লক্ষ করে ইন্দিরা গান্ধী সহজেই ধরতে পেরেছিলেন যে, এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁর সরকার যত দৃঢ় হতে থাকবে, ততই এই নেতারা আতঙ্কিত হতে থাকবেন, আপসের রাস্তা খুঁজবেন। বাস্তবে ঘটেছেও তাই।

সিপিএম-এর সঙ্গে যুক্ত রেলকর্মীরা ও তাদের প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা ১৬ মে থেকেই নানা জায়গায় ধর্মঘট ভেঙে কাজে যোগ দিতে শুরু করেন। নেতারা তাঁদের আটকানো দূরে থাক, যেখানে যেখানে ধর্মঘটের পক্ষে কর্মীদের অটুট মনোবল দেখেছেন, সেখানে কৌশলে কর্মীদের কাজে যোগ না দিয়ে মাইনে তুলতে যাওয়ার জন্য প্রভাবিত করেছেন এ কথা জেনেই যে, মাইনে তুলতে গেলেই কর্মীদের গ্রেফতার করা হবে এবং জোর করে তাঁদের দিয়ে কাজ করাবে সরকার।

এই অবস্থায় ২৮ মে বিনা শর্তে রেল ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়ে ২৬ মে জেলের ভিতর থেকে ফার্নান্ডেজ সহ অ্যাকশন কমিটির সদস্যরা একটি চিঠি পাঠান। লক্ষণীয়, সেই চিঠি ২৭ মে অ্যাকশন কমিটির বৈঠকে পড়ে শুনিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটি সংবাদপত্রগুলির দফতরে পাঠানো ও ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছিলেন সিপিএম নেতা সমর মুখার্জী স্বয়ং। পরিস্থিতি দেখে কমরেড প্রীতীশ চন্দ ও এআইআরএফ নেতা প্রিয় গুপ্ত এই চিঠিতে উল্লেখিত ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কমিটির সকলের মতামত রেকর্ড করার জন্য চাপ দেন এবং ইউটিইউসি-লেনিন সরণির পক্ষ থেকে কমরেড চন্দ ধর্মঘট প্রত্যাহারের সেই প্রস্তাবের স্পষ্ট বিরোধিতা করেন।

নেতৃত্বকারী দলগুলি পুঁজিবাদের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছিল

১৯৭৪-এর ধর্মঘটে সামগ্রিকভাবে সাধারণ রেলকর্মীদের মনোবল যে রকম অটুট ছিল এবং দেশের জনসাধারণের এই ধর্মঘটে যে অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল, তাতে আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী চেতনার উপর ভরসা রেখে আরও কিছুদিন এই ধর্মঘট চালিয়ে গেলে সরকারের অনমনীয় মনোভাবের উপযুক্ত জবাব দেওয়া যেত।

সেই সময়েই এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে 'ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের পর্যালোচনা' পুস্তকে বলা হয়েছিল, "ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার সংবাদ রেডিও ও কাগজে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বহু জায়গায় রেলকর্মীরা তারপরেও দু-একদিন বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মঘট চালিয়ে গিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, তারা তখনও লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। আর, অন্য দিকে ইন্দিরা সরকার বাইরে যতই অনমনীয় মনোভাব দেখাক না কেন, ভেতরে ভেতরে অবস্থা তাদের পক্ষেও তখন চূড়ান্ত খারাপের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধী যেটা আশা করেছিলেন এবং দেশের ভিতরে শিল্পপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীদের আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, সাত-আট দিনের মধ্যেই রেল ধর্মঘট তিনি ভেঙে দিতে পারবেন এবং সেরকমভাবেই, বড় জোর তার দু'এক দিনের বেশি প্রস্তুতি নিয়ে রেল ধর্মঘট মোকাবিলা করার জন্য তিনি এগিয়েছিলেন, সরকারি এত অত্যাচার এবং নেতৃত্বের এত ত্রুটি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও রেলকর্মীদের বিস্ময়কর সংগ্রামী মনোবলের জন্য দীর্ঘদিন পার হওয়ার পরও তার সে আকাঙ্ক্ষা সফল হয়নি। ফলে, গোড়ার দিকে শিল্পপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিরা রেল ধর্মঘটে সরকারি আচরণের যতই তারিফ করুক না কেন, দীর্ঘদিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও রেল ধর্মঘট ভাঙার কোনও লক্ষণই যখন দেখা গেল না, এবং স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পে ও অর্থনীতিতে তার চাপ প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করল, তখন সেই সমস্ত শিল্পপতি এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই আতঙ্কিত হয়ে গিয়ে রেল-কর্মীদের সাথে মীমাংসায় যাবার জন্য তাদেরই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। এই অবস্থায় রেল ধর্মঘট আর কিছুদিন চললে ইন্দিরা সরকারের পক্ষে নতি স্বীকার করে রেলকর্মীদের সাথে একটা সম্মানজনক মীমাংসায় আসা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা থাকত না। ... অথচ, ঠিক যে সময়ে রেলশ্রমিকরা প্রায় বিজয়ের মুখে এসে গিয়েছিল, সেই সময়েই রেল আন্দোলনের বর্তমান নেতৃত্ব যেভাবে নিজেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়ে ইন্দিরা সরকারকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করলেন, এবং তার দ্বারা রেলশ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, তাতে লেনিনের ভাষায় তাদের 'ওয়ার্স্ট ক্রিমিনাল' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বাস্তবে রেল ধর্মঘটের ক্ষেত্রে আগাগোড়া এই দলগুলি যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেছে এবং আন্দোলনের চরম মুহূর্তে জাতীয় স্বার্থের দোহাই তুলে যেভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে, তাতে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই তিনটি দলই বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে গিয়েছে।"

এইভাবে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ঐতিহাসিক এই রেল ধর্মঘট নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এসপি, সিপিআই ও সিপিএম— এই তিনটি দলের চূড়ান্ত বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ও আপসকামী মনোভাবের জন্য শোচনীয় পরিণতিতে শেষ হয়।

আজ রেলকে বাঁচানোর প্রয়োজনেই সংগঠিত রেলকর্মী আন্দোলন দরকার। আর সেই আন্দোলনকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে বিগত আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার ডাক কনভেনশনে

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার প্রতিবাদে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে ১৭ জুন কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি, প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। জনস্বার্থবিরোধী এই শিক্ষানীতিকে প্রতিরোধ করার ডাক দেন তিনি।

অধ্যাপিকা সোমা রায় বলেন, ইতিহাসের সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। হিন্দুত্ববাদী ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হচ্ছে। আর্যরা এ দেশেরই অধিবাসী, বাইরে থেকে আসেনি, মোগল যুগকে সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে যাতে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা গড়ে উঠবে না ছাত্রদের। সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রূপালী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমকে তুলে ধরার কথা বলা হচ্ছে, তার ভিত্তিটাই ভুল। জ্ঞানের কখনও সীমা হয় না। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম নিয়ে গবেষণার জন্য যথেষ্ট টাকা দেওয়া হচ্ছে।

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার প্রথম দিকে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে এ শিক্ষানীতি রূপায়ণে তৎপর হচ্ছে। চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে পাঁচ ধরনের ডিগ্রিধারী ছাত্র তৈরি হবে। জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটিই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে এই শিক্ষানীতির প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। আগামী দিনে আরও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমিটির রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র। প্রতিনিধিরা প্রস্তাবকে বিপুল ভাবে সমর্থন জানান।

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি আদায়

এআইকেকেএমএস উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১২ জুন রায়গঞ্জ কর্ণজোড়াতে ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (ডিডিএ)-এর দপ্তরে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি ছিল, সারের কালোবাজারি বন্ধ করে এমআরপি রেটে রাসায়নিক সার সরবরাহ করতে হবে, সমস্ত কৃষিজ পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক দাম (এসএসপি) ঘোষণা করতে হবে, ইটাহার ব্লকে শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ডেপুটেশনে তিন শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। ডিডিএ প্রতিনিধিদের জানান, ভুট্টার এমএসপি ২০০০ টাকা থাকলেও রাজ্য সরকার তা ঘোষণা করছে না। শিলাবৃষ্টিতে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ সহ কিছু দাবি তিনি মেনে নেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক দয়াল সিংহ, অফিস সম্পাদক তপন কুমার দাস, সহ সভাপতি নকুল রাম, আমিরুল ইসলাম, হবিবুর রহমান, মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ, রহিমুল হক প্রমুখ।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

পাঁচের পাতার পর

ক্ষমতার চারপাশে ঘোরা ভোটবাজ দলগুলিকে যে কোনও প্রকারে পঞ্চায়েত দখলে এত প্ররোচিত করে। সে জন্য বহু জায়গায় অনৈতিক জোট করতেও দ্বিধা করে না। উপরের নেতারা চোখ বুঝে থেকে বিষয়টা ঘটতে দেয়। একসময়ের চরম বিরোধী সিপিএম-কংগ্রেস এখন জোটসঙ্গী। আবার কুলতলির মৈপীঠে দেখা গেছে ২০১৮-র নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)-র বিরুদ্ধে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস এক সাথে লড়েছিল। বিজেপির সাথে নানা অজুহাতে সিপিএম কিংবা তৃণমূল বা কংগ্রেসের হাত মেলানো বিরল নয়।

এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে এস ইউ সি আই (সি) মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে গ্রামীণ মানুষের কাছে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছে। গ্রামীণ এলাকার বেকারত্ব সারা দেশেই সর্বকালীন রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। সরকার একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে কৃষিনীতি নেওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে কৃষি ক্রমাগত অলাভজনক হয়ে পড়ছে। ফলে এই ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কমছে। কৃষিকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলা, ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করার কোনও উদ্যোগই কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের নেই। বৃহৎ পুঁজির ডেয়ারির সাথে প্রতিযোগিতায় গ্রামীণ মানুষের গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে রোজগার বন্ধ হয়ে পড়েছে প্রায়। একশো দিনের কাজে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ কমাচ্ছে, তা আটকেও রাখছে। অন্য দিকে রাজ্যের তৃণমূলের দুর্নীতিতে তা আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

প্রতি দিন গ্রাম থেকে হাজারে হাজারে মানুষকে শহরে বা ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাতে হয় সামান্য রোজগারের আশায়। মূল্যবৃদ্ধি এবং রোজগারহীনতা মিলে এমন পরিস্থিতি যে, গ্রামাঞ্চলে সরষের তেলের এক-দু'টাকার পাউচ, কিংবা সামান্য মশলাপাতির বিক্রিও কমছে। মানুষের কেনার ক্ষমতাই নেই। জ্বালানির কেরোসিন এখন আগুন দাম, অথচ গ্যাস কেনার সামর্থ্য নেই বহু পরিবারের। পরিবারগুলোকে ফিরে যেতে হচ্ছে কাঠের জ্বালের যুগে। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের বড়াই সরকার করলেও কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারের বিদ্যুৎ নীতির ফলে বহু মানুষেরই বিদ্যুতের বিল জোগানোর ক্ষমতাই নেই। গ্রামে শিক্ষার জন্য স্থাপিত এসএসকে, এমএসকে-গুলোর অভিভাবকত্ব নিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তর আর শিক্ষা দপ্তরের ঠেলাঠেলি চলছে। প্রাইমারি স্কুলগুলো শিক্ষকের অভাবে, সরঞ্জামের অভাবে ধুঁকছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দিয়ে, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করে ও শিক্ষাকে পুরোপুরি বেসরকারি করার যে নীতি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার নিয়েছে, তাতে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত গরিব মানুষের ঘরে শিক্ষার আলো নিভতে চলেছে। মিড ডে মিল, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ওপর চলছে সীমাহীন শোষণ। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতালগুলোতে সামান্য জ্বর-পেটখারাপের ওষুধ কিংবা ফোঁড়া কাটার মতো অপারেশনও এখন হয় না। মানুষকে হত্যে দিতে হয় শহরের হাসপাতালের দরজায়। এগুলি নিয়ে দাবি তুলতে কোনও পঞ্চায়েতকেই দেখা যায় না। সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত মানুষকে সরকার একটা জিনিস সহজে এবং সস্তায় দিতে চায় তা হল— মদ। ফলে গ্রামীণ পরিবারে শান্তি এখন বিপন্ন। তাই পঞ্চায়েতের মধ্যে যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে হয়, মানুষের প্রাপ্য সুবিধা, পঞ্চায়েতের কাজ কিছুটাও আদায় করতে হয়, তাহলে গ্রামীণ এলাকাতেও একের পর এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির চক্করে ফাঁসলে এই মতলববাজ নেতাদের ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে ঘরের সন্তানদের রক্ত ঝরা বারবার দেখতে হবে।

এই অবক্ষয়ী ধারার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের শক্তি হিসাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এসইউসিআই (সি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং গ্রামীণ সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কোচবিহার ঃ মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ প্রশাসন

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস, খুন-জখমের তীব্র নিন্দা করে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ ১৬ জুন বিভাস চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী, সান্টু গুপ্ত, অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, বিমল চ্যাটার্জী, সুজাত ভদ্র, মীরাতুন নাহার, পার্থসারথি সেনগুপ্ত, রেশমী সেন, ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, পবিত্র গুপ্ত, মালবিকা চ্যাটার্জী, নিরঞ্জন প্রধান, শুক্তিশুভ্র প্রধান, তরুণ কান্তি নস্কর, অনুপ ব্যানার্জী, রূপশ্রী কাহালি, তরুণ মণ্ডল, পল্লব কীর্তনিয়া প্রমুখ বিশিষ্টজনের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলেছে, নির্বাচনের প্রথম দিন থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠন হচ্ছে। একাধিক ব্যক্তির প্রাণ গিয়েছে, আহত হয়েছে বহু। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ হয়েছে। সরকারি প্রশাসন এই সন্ত্রাস দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তারা কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকে সন্ত্রাসে সাহায্য করেছে। সন্ত্রাসকে মুখ্যমন্ত্রীর লঘু করে দেখানোরও নিন্দা করা হয়েছে।

মঞ্চ বলেছে, রাজ্যে অতীতেও নির্বাচনে খুন, সন্ত্রাস হয়েছে। আমরা নির্দ্বিধায় তার নিন্দা করেছি। এবার আমরা আশা করেছিলাম, নির্বাচনী সন্ত্রাস দমনে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন সক্রিয় হবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আমরা চাই, অবিলম্বে প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত শাসক দল রক্তপাত ও প্রাণহানি বন্ধে উদ্যোগী হোক।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com